মানস সরকার

কোটর

রবিবার। ফ্ল্যাটে চাবি দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সাধনবাবুর সঙ্গে চোখাচুখি। ভদ্রলোক সরকারি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। হেডমাস্টারির একটা পোশাক পরে থাকেন সবসময়। তবে কথা বলেন না এমন নয়। সিঁড়ির একপাশে দাঁড়িয়ে একটুকরো হাসি সপাটে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছুড়ে দিলাম। স্পষ্ট দেখলাম সে হাসি তার চোখে গিয়ে লাগল। হাসিটা ফেরত পাব বলে দাঁড়িয়ে রইলাম। হিসেব বলছে পাক্কা ছ-সেকেন্ড ওইভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ছ-সেকেন্ড পর আমি বুঝলাম তিনি হাসি নিলেন কিছু দিলেন না। বরং যেন দেখলাম তার মুখে বিভ্রান্তির আঁকিবুকি। না আমি তার পিছনে যাইনি। ডাকিওনি। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসি। বাজারের দিকে এগোতে শুরু করি।

রবিবার বাজারে এলে মধ্যিখানে আমার একটা স্টপেজ আছে। এই স্টপেজের নাম ধনুর চায়ের দোকান। নিজের বাড়ি থেকে এই ফ্ল্যাটবাড়িতে এসে উঠেছিলাম পনেরো বছর আগে। দু-বছর আগে আমার এম বি এ পাস স্ত্রী আমাকে ডিভোর্স ঠুসে নিজের ছেলেকে নিয়ে এই শহরেরই ডাক্তারের সঙ্গে লিভ ইনে গলা বাড়িয়েছে। গলা বলছি কেন শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বাড়িয়েছে। ছেলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ রাখতে দেওয়া হয়নি। কোর্টে দাঁড়িয়ে ছেলেকে দেখব বলে দুবার চিঁচিঁ, বউয়ের সামনে তিনবার মিউমিউ, তারপর পাঁচবার ঘেউ ঘেউ আর শেষবার একবার হালুম করে পুরুষত্বের গন্ধ ছড়িয়ে, সেই যে এসেছি আর ওমুখো হইনি। এরপর আমি জীবনটাকে চব্বিশটা ঘণ্টা প্রতিদিনের হিসাবে একটা ভয়াবহ রুটিনের বাক্সে ঢুকিয়ে ফেলেছি। এই যে বাজার যাওয়ার আগে ধনুর দোকানের বেঞ্চিতে বসে আমি এককাপ চা খাই আর লোকের গজালি শুনি, তা ওই রুটিনেরই অংশ। কারোর মন্তব্যে আমি কোনো মন্তব্য করি না, সে বাজারদর হোক বা রেপ। ধনুর ভালো নাম কী, দু-বছর আগে জানার ইচ্ছে হয়েছিল। এখন হয় না। তবে ধনুর নাম তিরও হতে পারত। মানে ওর সার্ভিসটা তিরের মতোই। কিন্তু আমি জানি কাজের সঙ্গে নাম মেলে এমন কিছু পাওয়া যায় না।

ধনুর দোকানের বেঞ্চে এককোণে চুপ করে গিয়ে বসলাম। অর্ডার দেওয়ার দরকার নেই। ও জানে আমি কী চা খাই। এবং যথারীতি আমার চিনি ছাড়া লিকার দু-মিনিটের মাথায় আমার সামনে ঠক করে এসে বসল।

— কী করছে এরা ভোট বাজারে, ছ্যা ছ্যা!

সাধারণত ধনুর দোকানে এ গলার সাথে আমার আলাপ নেই। তাকিয়ে দেখলাম। এক দর্শনেই ছিপে মাছ তোলার মতো চিনেও নিলাম। এবং আমি নিশ্চিত, সঠিকভাবেই। নামটাও মনে ভেসে উঠল। এ কে মজুমদার। আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড। প্রত্যেকদিন নিজের ফ্ল্যাটে রাত নটা থেকে দশটা পর্যন্ত আমি সোশাল সাইটগুলো নিয়ে চটকাচটকি করতে বসি। ফেসবুক

আমার সবচেয়ে পছন্দের। তো এই এ কে মজুমদারকে দেখি, নানারকম জ্ঞানগর্ভ কথা পোস্টাতে। সমাজসুলভ হলেই আমি লাইক দিই। ভাবনাচিন্তায় না ডুবে। এনারটাতেও দিই। সবাইকে দিই। রুটিন মেনে।

— দু-একজনের নাম বলুন না।

এটা ছাড়ল ধনুর দোকানের আর এক নিয়মিত কাস্টমার মানিক ঘোষ। বয়সের স্কোর ষাট মেরেছে বছর দুয়েক। অনেকটা সময় দেয় এখন এদিকে।

— খেপেছেন! আমি ছাড়ি আর ঠিকঠাক জায়গায় চলে যাক তারপর। এখন হেব্বি চাপ।

হেব্বির 'ব'-এর উপর একটু বাড়তি জোর দিল এ কে মজুমদার। কেলো। এফবি-তে তো এভাবে বলে না। দুটো ভাষার ধরন দু-রকম শোনাচ্ছে। চা শেষ আমার। দেখলাম, এ কে মজুমদার দোকান ছেড়ে রাস্তায় নামলেন। পয়সা মিটিয়ে আমিও। দু-এক পা জোর কদমে ফেলে ধরেও নিলাম।

— নমস্কার। আপনি এ কে মজুমদার তো?

— নমস্কার। না তো। ভুল হচ্ছে কোথাও কি! ঠোঁটে মৃদু হাসি ছিটিয়ে বলে উঠল লোকটা।

ভালো করে তাকালাম। ভড়কে গেলাম। ভুল করতেই পারি আমি। সারাজীবন ধরে করেছি। যতদূর মনে পড়ছে, এফ বি-তে এ কে মজুমদারের মুখটা আর একটু ফর্সা, টানটান, লাস্যময় ছিল। বয়সও একটু কম ছিল। বললাম, আসলে মনে হল, আমি আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে আছি। নিয়মিত লাইকও দিই আপনার পোস্টে।

— তাই? হতেও পারে। ঠিক প্লেস করতে পারছি না ভাই। কিছু মনে করবেন না।

কথা এগোনো আর সুবিধের ঠেকল না। সরে এলাম। তাছাড়া বাজার ডাকছিল।

বাজারে গিয়ে মনে খুশি ঘাই মারল। তোফা লাগে। বাজার, মল বা আইনক্স। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে। একটু-আধটু লোক দেখানো দরদাম করলেও হেক্কার নিয়ে ঢুকি এসব জায়গায়। থাকি মফস্সলে। মফস্সল বাজার নগরের থেকে আবার একটু আলাদা। তবে ওই 'স্যার-ফ্যার' বা আঙুল দিয়ে সেতার বাজানোর মতো ক্রেডিট কার্ড নাচানো এ সব এ বাজারেও চলে এসেছে। সফিসটিকেটেড হবার পথে কিন্তু বাবুয়ানির জার্সিটার এখানে পরিচিত বেশি।

বাজারে এন্ট্রি মেরে আমি সবসময় প্রথম দর্শন নিই মাছের বাজারের। মাছ কেনার থেকেও দর্শনে সুখ বেশি আমার। নিজের আধুনিক বাঙালি সত্তার সাথে সেটা বেশ হাত ধরাধরি করে সেলফি তোলে। আমি তুলি মাছের সাথে। দু-একবার পোস্ট দিয়ে সাড়ে চারশো লাইক খেয়ে পেট মোটা করে ফেলেছিলাম। রোববারের মাছের বাজার আমার শহরে আট-এর দশকের সিনেমা হলের ভিড়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

এদিক-ওদিক দরদাম নিয়ে, টানা হ্যাঁচড়া করলেও মাছ কেনার ক্ষেত্রে দু-একজন আমার

ফিক্সড দোকানি আছে। সকাল থেকেই আজ ইলিশের জন্য মুখে লোভের ঢেউ উঠেছে। দু-দুটো জায়গায় কেজি বারোশো শুনলাম। তবুও ইলিশই কিনব। মাছটা এখন কিনলে তাও লোকে ঘাড় ফিরিয়ে বা আড়চোখে দেখে।

এবার গিয়ে পড়লাম পাঁচুদার কাছে। মাছি তো ভনভন করছেই। ওর চারপাশে লোকও মাছির মতোই ছেঁকে ধরেছে। সব লোকের চোখ মাছের উপর। সে সমস্ত চোখে মাছের ছায়া। দু-একজনের পেছন থেকেই হাঁক পড়লাম— পাঁচুদা, ইলিশ কত করে যাচ্ছে?

কোনো জবাব এল না। এক মনে মাছ কাটা হচ্ছে— ঘ্যাঁচ-ঘোঁচ। প্রায় মিনিট পাঁচেক খরচা হয়ে গেল। আবার জিজ্ঞাসা করলাম। এবার না তাকিয়েই উত্তর আসে— হাজার।

তার মানে দুশো কম। সাইজও নেহাত খারাপ নয়। ওজনও কেজিখানেক তো বটেই। বললাম— আটশো হবে?

চোখ বুজে ঘাড় নাড়ল পাঁচুদা। বললাম— ঠিক আছে। একটা দাও। একটু কম করতে পারতে। আমি তো তোমার রেগুলার খদ্দের।

চারপাশের কেউ আমার দিকে তাকাল না। পাঁচুদা বলল— কে আপনি?

ভ্রু বেঁকেছিল আমার। এই তো গত সপ্তাহতেই এসেছিলাম। স্যার-স্যার করে কথা বলছিল। আশ্চর্য। বললাম— তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?

— না তো।

ঘাম আসছিল। মাথা দপদপ করছিল। বললাম— তুমি আমাকে চেনো না?

— না।

— ঠিক আছে। ছেড়ে দাও। মাছটাও অন্য কোথাও থেকে নিয়ে নিচ্ছি।

— আপনার ব্যাপার।

একটা ভেটকি তুলে কাটায় মন দিল পাঁচুদা। বিভ্রান্তিতে লাট্টুর মতো ঘুরছিলাম। পাঁচুদাকে ছেড়ে এগিয়ে গেলাম। একটা ব্যাপারে অল্প হলেও স্বস্তি লাগছিল। আশেপাশের কেউই আমাদের কারোর দিকেই তাকাল না। ফেসবুকের 'এফ'টার মতো মাথা নিজেদের স্মার্টফোনে লটকে রেখেছিল।

মাছের বাজার থেকে বেরিয়ে বাঁ কোণে একটা ধাপিস পড়ে। একটু বসে পড়লাম। মাথার দপদপানি। পাশে চারটে ছেলে বসে আছে। কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলছে না। নিজেদের স্মার্ট ফোনে বুড়ো আঙুলটা শুধু খুব ব্যস্তভাবে বুলিয়ে যাচ্ছে। ঠোঁটে একটা মৃদু স্বর্গীয় হাসি ঝুলছে সবার। চোখের মণিগুলো নড়ছিল।

একটু বিশ্রাম খেয়ে উঠে দাঁড়াতেই স্বাভাবিক হয়ে যাই। আবার ঢুকি মাছের বাজারে। আরও ভিড় বেড়েছে। সামনে একটা অচেনা, নতুন ছেলে বেশ কয়েকটা ইলিশ নিয়ে বসেছে। নধর চেহারার। গলা একটু গম্ভীর করে বলি, কত করে?

— হাজার টাকা।

— কেমন হবে?

— খেয়ে দাম নেবেন, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের মতো হেয়ার কাট নিয়ে ছেলেটা বলল।

মজা নিচ্ছিলাম। বললাম, ধরো, আর এলাম না। তখন?

— আসবেন না। আমার কপাল তো নিতে পারবেন না স্যার।

মনটায় বেশ খুশির হাওয়ার দমক পড়ছিল। বললাম— ঠিক আছে। একটা ওজন করো।

ওজন করে বেশ কায়দা করে মাছটাকে গাথা পিস করে কাটতে কাটতে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান বলল— আসলে, আমি আপনাকে চিনি স্যার। আপনি মার্বেল হাউসের ফ্ল্যাটে থাকেন।

খুশি ছিলাম। অবাকও হলাম। বললাম— ঠিক। তুমি চেন?

— কী যে বলেন স্যার! আপনি তো টেকসোয় কাজ করেন।

নতুন ব্যাঙ্কের গন্ধমাখা নোটগুলো বাড়িয়ে দিতে দিতে বলি— টেকসো নয়। ট্যাক্স। তুমি রোজ বসো?

— হ্যাঁ স্যার। রোজ। না বসে উপায় আছে স্যার। অনেকগুলো ভাইবোন। ভাইটা স্যার পড়াশোনায় খুউব ভালো... আপনার দেখলেই ভালো লাগবে। স্যার আমার ফোন নম্বরটা রাখুন। আপনাকে আসতে হবে না। ফোন করে বলবেন। আমিই ভাইকে দিয়ে পৌঁছে দেব মাছ।

তাকিয়ে দেখি ভিজিটিং কার্ড। মলয় মণ্ডল। অর্ডার সাপ্লায়ার। অবাক হলাম দেখে যে কার্ডে ঝলকাচ্ছে মেল নম্বর। শালা গুগলও বুঝছে মাছের সাথে বাঙালির মাখা-মাখা কেসটা।

ভিজিটিং কার্ড পকেটে ঢুকিয়ে সামনে তাকাতেই প্রাণ ধুকুপুকু। সামনে অতীশ সাহার মুদিখানার দোকান। গঞ্জেরবাজারে সবচেয়ে বড়ো। মলের দাপাদাপিতেও যেভাবে খদ্দের টেনে রেখেছে, ভাবার মতো। তবে চাকচিক্য আগের চেয়ে শানিয়েছে অনেকগুণে। পুরোনো বয়ামের বদলে প্লাস্টিকের সুদৃশ্য জার। ঠোঙার বদলে নির্দিষ্ট ওজনের জিনিসের প্যাকেটের অপশন। টাকার বদলে পে-টি-এম। উচ্চবর্গীয় মানুষজনের নিঃশব্দ কেনাকাটি। তো এরই মধ্যে প্রায়শই কলকাতা যাবার জন্য স্টেশন থেকে একসঙ্গে ট্রেন ধরেন।

এগিয়ে গেলাম। শঙ্কর সেন শান্তভাবে কেনাকাটা সারছেন। বেশ বিধিসম্মত সে কেনাকাটা। থলে নয়, বিগশপারে একে একে ঢোকাচ্ছেন— এক প্যাকেট গ্রিন টি, দু-প্যাকেট পাস্তা, পাঁচ প্যাকেট রসুন পেস্ট, একটা সয়া সস, দু-প্যাকেট বিরিয়ানি মশলা, গুঁড়ো গরম মশলা। মাল নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই আমার মুখোমুখি। হাসলাম। উনি হাসলেন। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত। বললাম, বাজার হল?

উনি অপ্রস্তুতের হাসি দিলেন এবার। আবার বললাম— কাটোয়া ধরছেন না আর?

উনি ঘাড় নাড়লেন দুদিকে। এবার বললাম— আপনাকে খুব মিস করি কিন্তু।

— ভাই, আপনি বলছেন বটে এত কথা। কিন্তু আপনি ঠিক কে, বুঝতে পারছি না।

— কী, বলছেন কী! এতদিন ধরে কাটোয়া ট্রেনের ডেলি প্যাসেঞ্জার আপনি— আমি। আর আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না!

— বিশ্বাস করুন, সত্যিই পারছি না। আপনি বোধহয় কিছু ভুল করছেন।

— খেয়ে দাম নেবেন, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের মতো হেয়ার কাট নিয়ে ছেলেটা বলল।

মজা নিচ্ছিলাম। বললাম, ধরো, আর এলাম না। তখন?

— আসবেন না। আমার কপাল তো নিতে পারবেন না স্যার।

মনটায় বেশ খুশির হাওয়ার দমক পড়ছিল। বললাম— ঠিক আছে। একটা ওজন করো।

ওজন করে বেশ কায়দা করে মাছটাকে গাথা পিস করে কাটতে কাটতে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান বলল— আসলে, আমি আপনাকে চিনি স্যার। আপনি মার্বেল হাউসের ফ্ল্যাটে থাকেন।

খুশি ছিলাম। অবাকও হলাম। বললাম— ঠিক। তুমি চেন?

— কী যে বলেন স্যার! আপনি তো টেকসোয় কাজ করেন।

নতুন ব্যাঙ্কের গন্ধমাখা নোটগুলো বাড়িয়ে দিতে দিতে বলি— টেকসো নয়। ট্যাক্স। তুমি রোজ বসো?

— হ্যাঁ স্যার। রোজ। না বসে উপায় আছে স্যার। অনেকগুলো ভাইবোন। ভাইটা স্যার পড়াশোনায় খুউব ভালো... আপনার দেখলেই ভালো লাগবে। স্যার আমার ফোন নম্বরটা রাখুন। আপনাকে আসতে হবে না। ফোন করে বলবেন। আমিই ভাইকে দিয়ে পৌঁছে দেব মাছ।

তাকিয়ে দেখি ভিজিটিং কার্ড। মলয় মণ্ডল। অর্ডার সাপ্লায়ার। অবাক হলাম দেখে যে কার্ডে ঝলকাচ্ছে মেল নম্বর। শালা গুগলও বুঝছে মাছের সাথে বাঙালির মাখা-মাখা কেসটা।

ভিজিটিং কার্ড পকেটে ঢুকিয়ে সামনে তাকাতেই প্রাণ ধুকুপুকু। সামনে অতীশ সাহার মুদিখানার দোকান। গঞ্জেরবাজারে সবচেয়ে বড়ো। মলের দাপাদাপিতেও যেভাবে খদ্দের টেনে রেখেছে, ভাবার মতো। তবে চাকচিক্য আগের চেয়ে শানিয়েছে অনেকগুণে। পুরোনো বয়ামের বদলে প্লাস্টিকের সুদৃশ্য জার। ঠোঙার বদলে নির্দিষ্ট ওজনের জিনিসের প্যাকেটের অপশন। টাকার বদলে পে-টি-এম। উচ্চবর্গীয় মানুষজনের নিঃশব্দ কেনাকাটি। তো এরই মধ্যে প্রায়শই কলকাতা যাবার জন্য স্টেশন থেকে একসঙ্গে ট্রেন ধরেন।

এগিয়ে গেলাম। শঙ্কর সেন শান্তভাবে কেনাকাটা সারছেন। বেশ বিধিসম্মত সে কেনাকাটা। থলে নয়, বিগশপারে একে একে ঢোকাচ্ছেন— এক প্যাকেট গ্রিন টি, দু-প্যাকেট পাস্তা, পাঁচ প্যাকেট রসুন পেস্ট, একটা সয়া সস, দু-প্যাকেট বিরিয়ানি মশলা, গুঁড়ো গরম মশলা। মাল নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই আমার মুখোমুখি। হাসলাম। উনি হাসলেন। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত। বললাম, বাজার হল?

উনি অপ্রস্তুতের হাসি দিলেন এবার। আবার বললাম— কাটোয়া ধরছেন না আর?

উনি ঘাড় নাড়লেন দুদিকে। এবার বললাম— আপনাকে খুব মিস করি কিন্তু।

— ভাই, আপনি বলছেন বটে এত কথা। কিন্তু আপনি ঠিক কে, বুঝতে পারছি না।

— কী, বলছেন কী! এতদিন ধরে কাটোয়া ট্রেনের ডেলি প্যাসেঞ্জার আপনি— আমি। আর আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না!

— বিশ্বাস করুন, সত্যিই পারছি না। আপনি বোধহয় কিছু ভুল করছেন।

চোয়াল শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এরপর খুব একটা কিছু বলার থাকতে পারে না। দেখলাম, উনি ধীরে ধীরে, একবারও পিছনে না তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন। এগোতেই থাকলেন। একা। সাথে নিজের জিনিস ভর্তি ব্যাগ।

তাড়াতাড়ি বাজার শেষ করে এবার ফ্ল্যাট-এর গর্তে ঢুকে পড়তে চাইলাম। ব্রেকফাস্ট খেয়েই টিভির চ্যানেলে চোখ বুলিয়ে নেব। রান্নার লোক ততক্ষণে চলে আসবে। খবরের কাগজ নিই না। পড়ার ধৈর্য্য নেই। তারপর সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা— এক ঘণ্টা কম্পিউটারে গেম খেলব। তারপর চান। খাওয়া। ঘুম। বিকেল থেকে রাতের খাওয়ার আগে পর্যন্ত দুটো মুভি দেখব কমপিউটারে। তারপর... তারপর...

হন হন করে কোনো দিকে না তাকিয়ে হাঁটছিলাম। ফ্ল্যাটের গেটে ঢোকার আগেই কানে এল।

— বাবা

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি। সাইকেল হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে বছর বারো-তেরোর একটি ছেলে। ছোটোবেলায় আয়নার সামনে দাঁড়ালে অনেকবার এ মুখটাই দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই ঠিক চিনে উঠতে পারলাম না ছেলেটাকে। অস্ফুটে বেরিয়ে এল— কে?

আমার রুক্ষ স্বর। চুপ করেও বলে ফেলল ছেলেটা— আমি রনি বাবা। তুমি কি চিনতে পারছ না!

নিজের কোটর তখন আমাকে ডাকছে। ওখানে ঢুকে পড়লেই শান্তি। আমি প্রায় হোঁচট খেতে খেতে ফ্ল্যাটের গেট পেরোতে পেরোতে বললাম— না, ঠিক চিনতে পারলাম না ...

ঠিক তখনই আমার সামনের লিফটের দরজাটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।